

জীবাশ্ম -জ্বালানির পর্ব পেরিয়ে ভবিষ্যতের সন্ধানে: সান্তা মার্তা ও উত্তরণের রাজনীতি

Posted on September 29, 2026 by Debajit Chanda

বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয় যত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতাও। ততই বাড়ছে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু-আলোচনা প্রক্রিয়া নিয়ে হতাশাও। দীর্ঘ তিন দশক কাল জুড়ে একের পর এক কপ (Conference of the Parties) বৈঠকে একাধিক জরুরি সতর্কবার্তা ও ঘোষণাপত্র তৈরি হয়েছে। বাস্তবে জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন অব্যাহত। সেই সঙ্গে অব্যাহত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ও বিপজ্জনক মাত্রার কার্বন নিঃসরণও। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ-২৮ সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার’ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে; কার্যক্ষেত্রে অগ্রগতি নি:সন্দেহে সীমিত ও হতাশাব্যঞ্জক। খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট তার প্রমাণ। সেই রিপোর্ট বলছে, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির অংশ হিসেবে

জাতিসংঘের প্রক্রিয়ায় দেশগুলির দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে নির্গমন কমবে মাত্র ১২%। অথচ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নকে ১.৫° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হলে ২০৩৫ সালের মধ্যে নির্গমন কমিয়ে আনতে হবে ৫০ শতাংশ। স্বভাবতই বিপন্নতার ও হতাশার এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কলম্বিয়ার সান্তা মার্তা শীর্ষ সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, সন্দেহ নেই। সময়ের দাবী মেনেই, রাষ্ট্রপুঞ্জের আনুষ্ঠানিক জলবায়ু কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে তেল, গ্যাস ও কয়লার উপর নির্ভরতা অতিক্রম করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নমুখী একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠনের প্রথম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল এই সম্মেলন।

গত ২৪-২৯ এপ্রিল কলম্বিয়ার ঐতিহাসিক শহর সান্তা মার্তায় অনুষ্ঠিত ৬ দিন ব্যাপী এই জলবায়ু সম্মেলনের যৌথ আয়োজক কলম্বিয়া ও নেদারল্যান্ডস। এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ৫৭টি দেশ অংশগ্রহণ করে, যাদের সম্মিলিত অর্থনৈতিক ব্যাপ্তি বিশ্বের মোট অর্থনীতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যেমন ছিল জলবায়ু বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্র, ছোট দ্বীপরাষ্ট্র, উন্নয়নশীল অর্থনীতি, জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিকারক দেশ, তেমনি ছিল ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, অ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া ও মেক্সিকোর মতো গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদক দেশ। আসলে দীর্ঘসূত্রিতা ও অচলাবস্থায় আক্রান্ত কপ প্রক্রিয়ার বিপরীতে সান্তা মার্তা নিজেকে তুলে ধরতে চেয়েছে একটি ‘ইচ্ছুকদের জোট’ (coalition of the willing) হিসেবে। সর্বসম্মতি অর্জন না করা গেলেও উত্তরণ-প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে, জাতীয় রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থায়নের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজতে যে সব দেশ প্রস্তুত তাদের মধ্যে বাস্তব সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

সম্মেলনটির সময়কাল রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইরানের

বিরুদ্ধে মার্কিন – ইজরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বিশ্ব জ্বালানি বাজার যখন রীতিমতো অস্থির, বহু দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসাকে শুধুই জলবায়ু সংকট মোকাবিলার উপায় হিসেবে নয় বরং জ্বালানি-স্বনির্ভরতা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবেও দেখছে।

সান্তা মার্তা সম্মেলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যায় নয়; জলবায়ু রাজনীতিকে কপ-আলোচনার ক্রমশ ক্লান্তিকর ও সীমাবদ্ধ কাঠামোর বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় নিহিত।

কপ(COP) কাঠামোর সংকট

বহু সরকার, গবেষক এবং জলবায়ু আন্দোলনের কাছে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু প্রক্রিয়া নিয়ে হতাশা শুধু যে অগ্রগতির অভাব থেকেই তৈরি হয়েছে তেমনটা নয়; বরং আলোচনার কাঠামোর মধ্যেই নিহিত গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিও এই হতাশাকে তীব্র করেছে। জলবায়ু সম্মেলনগুলি বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ সম্পর্কে ক্রমশ আরও জরুরি সতর্কবার্তা ও ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে গেলেও, বাস্তবে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদনের অব্যাহত সম্প্রসারণ রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে কপ প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সতর্কতা ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বহু ক্ষেত্রেই বৃহৎ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদক দেশগুলিকে কঠোরতর অঙ্গীকার শিথিল করতে বা আটকে দিতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি সম্মেলনগুলিতে শিল্পগোষ্ঠীর লবিস্টদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এই ধারণা সুদৃঢ় করেছে যে প্রক্রিয়াটি ক্রমশ প্রভাবশালী কর্পোরেট স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বেলেমে অনুষ্ঠিত কপ-৩০ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতি পঁচিশ জনের একজন জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের লবির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এমনকি যেখানে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ভাষা

চূড়ান্ত নথিতে স্থান পেয়েছে সেখানেও বাস্তবায়ন দুর্বল থেকেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির সম্প্রসারণ প্রায় বাধাহীনভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে এই ঐকমত্য-নির্ভর প্রক্রিয়ার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের স্বার্থ, কর্পোরেট লবিং এবং ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অচলাবস্থা এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে করতে এক অচলায়তনে পরিণত করেছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মূলত কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন; জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর রাজনৈতিক অর্থনীতির রূপান্তর সেখানে কার্যত অনুপস্থিত থেকে যায়। কার্বন অফসেট, নির্গমন-বাণিজ্য (emissions trading), কিংবা কার্বন ধারণ ও সংরক্ষণ (carbon capture and storage)-এর মতো প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানকে প্রায়শই এমন পথ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যেন জীবাশ্ম জ্বালানি আহরণ অব্যাহত রেখেও জলবায়ু সংকট মোকাবিলা করা যেতে পারে। কিন্তু সমালোচকদের মতে এই ধরনের উদ্যোগ প্রকৃত উত্তরণের কৌশল হিসেবে যতটা না কাজ করেছে, তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে কাঠামোগত পরিবর্তনকে বিলম্বিত করার উপায় হিসেবে, যাতে বিদ্যমান জ্বালানি ব্যবস্থা ও বিনিয়োগ কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে।

কপ কাঠামোকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান হতাশা ও সমালোচনা তাই শুধুমাত্র কূটনৈতিক অদক্ষতা বা সিদ্ধান্তহীনতার বিরুদ্ধে ছিল না; এর চারপাশে গড়ে ওঠা জলবায়ু শাসনের বৃহত্তর মডেলেরও সমালোচনা ছিল। এই মডেল প্রায়শই কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে, কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির সম্প্রসারণকে পরিচালিত করে এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগুলিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। জলবায়ু ন্যায়বিচারের পক্ষে আন্দোলনকারী এবং বহু গবেষকের কাছে তাই ক্রমশ কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে – নিরবচ্ছিন্ন সম্পদ আহরণ, পুঁজি সঞ্চয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর কাঠামোগতভাবে নির্ভরশীল একটি বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে আদৌ পরিবেশগত উত্তরণের প্রকল্প সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। কিম্বা যে মুনাফা-কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্হা বাস্তুতান্ত্রিক বিনাশ

ও জলবায়ু সংকটের কারণ, তাকে বজায় রেখে আদৌ বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোচন সম্ভব কি না।

কপের গণ্ডি পেরিয়ে: বাস্তবায়নের রাজনীতির উত্থান

এই প্রেক্ষাপটে সান্তা মার্তা এক ভিন্ন রাজনৈতিক যুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে আরেক দফা ঐকমত্য খোঁজার ক্ষেত্র হয়ে ওঠার পরিবর্তে, এই সম্মেলনে অংশ নেয় এমন সব দেশ, যারা প্রচলিত জলবায়ু কূটনীতির দীর্ঘসূত্রিতা ও অচলাবস্থার বাইরে গিয়ে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে আগ্রহী। ফলে এর মূল জোর ছিল আরেকটি ঘোষণাপত্র তৈরির ওপর নয়; বরং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার উপযোগী কাঠামো নির্মাণের ওপর। আর তাই সান্তা মার্তা, কপের মতো ঐকমত্য খোঁজার অকার্যকর ও ক্লান্তিকর চর্বিতচর্বনের গন্ডি পেরিয়ে, প্রয়োগ-বাস্তবতার রাজনীতির উত্থানের স্পষ্ট ঈঙ্গিত।

আলোচনার পরিসর ছাড়িয়ে বাস্তবায়নের দিকে

এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় সান্তা মার্তার বিভিন্ন আলোচনায়। সেখানে শুধু কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা হয়নি; বরং এমন কিছু বাস্তব প্রশ্ন উঠে এসেছে যেগুলির মোকাবিলায় কপ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই হিমশিম খাচ্ছে। যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর নির্ভরতা কীভাবে কমানো যায়; জীবাশ্ম-পরবর্তী ভবিষ্যতের উপযোগী করে বাণিজ্য ও আর্থিক কাঠামো কীভাবে পুনর্গঠিত করা যায়; মূল্যহীন হয়ে পড়া সম্পদ (stranded assets) কীভাবে সামাল দেওয়া হবে; বিভিন্ন দেশের উত্তরণ-রূপরেখার মধ্যে কীভাবে সমন্বয় আনা সম্ভব; এবং ঋণের বোঝায় জর্জরিত ও সম্পদ আহরণনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কোথা থেকে এবং কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে ইত্যাদি।

সরবরাহ–পার্শ্ব রাজনীতি ফিরিয়ে আনা

সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল জলবায়ু সংকটের সরবরাহ-পার্শ্ব (supply side)-কে স্পষ্টভাবে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসা। অতীতের অধিকাংশ জলবায়ু আলোচনা মূলত কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত ছিল, তা সে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত অভিযোজন বা চাহিদা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হোক না কেন। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির আহরণ ও উৎপাদনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার প্রশ্নটি সাধারণত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সান্তা মার্তায় তেল, গ্যাস ও কয়লার উৎপাদনের ক্রমাগত সম্প্রসারণকেই জলবায়ু রাজনীতির কেন্দ্রীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে আলোচনাগুলি সেই প্রশ্নগুলির আরও কাছাকাছি পৌঁছয় যা দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু ন্যায়বিচারের পক্ষে আন্দোলনকারীরা উত্থাপন করে আসছেন, পরিকল্পিতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি আহরণ কমানো ছাড়া প্রকৃত অর্থে কার্বনমুক্তকরণ (decarbonisation) আদৌ সম্ভব কি না।

জ্বালানি–সার্বভৌমত্ব ও ভূ–রাজনীতি

তবে সান্তা মার্তার এই বাস্তবায়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি জলবায়ু রাজনীতির ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক চরিত্রকেও সামনে নিয়ে এসেছে। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উত্তরণের প্রশ্নটি আর শুধু পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা হিসেবে আলোচিত হয়নি; বরং তা ক্রমেই জ্বালানি-সার্বভৌমত্ব, বাণিজ্য কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক বিভাজনের যুগে কৌশলগত স্বনির্ভরতার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ এবং বাজারের অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত জ্বালানি-সংকট বহু অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করেছে যে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা শুধু যে পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই নয় তাই নয়, ক্রমাগত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উৎস।

কেন্দ্রবিন্দুতে বিজ্ঞান

সান্তা মার্তা সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল জলবায়ু নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের ভূমিকাকে আরও কেন্দ্রীয় স্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা। অংশগ্রহণকারীরা বারবার বৈজ্ঞানিক সতর্কবার্তা এবং সরকারগুলির বাস্তব পদক্ষেপের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের কথা তুলে ধরেন। সায়েন্স প্যানেল ফর দ্য গ্লোবাল এনার্জি ট্রানজিশন (SPGET)-এর সূচনা এই প্রচেষ্টারই প্রতিফলন, যার লক্ষ্য ছিল উত্তরণ-পরিকল্পনাকে এমন বৈজ্ঞানিক সময়সীমার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কপ প্রক্রিয়ায় ফলাফল প্রায়শই রাজনৈতিক দরকষাকষির দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেখানে সান্তা মার্তা বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নকে কূটনৈতিক আপসের আরেকটি ক্ষেত্র হিসেবে নয়, বরং বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে।

জলবায়ু ন্যায়বিচার, ভূখণ্ড এবং উত্তরণের রাজনীতি

সান্তা মার্তার সরকারি সম্মেলন যদি প্রচলিত জলবায়ু কূটনীতির অচলাবস্থা নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রতিফলন হয়ে থাকে, তবে সামাজিক আন্দোলন, আদিবাসী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, পরিবেশবাদী নেটওয়ার্ক এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে আয়োজিত সমান্তরাল সমাবেশগুলি সেই বিতর্ককে আরও মৌলিক ও র্যাডিক্যাল দিকে নিয়ে যায়। ‘জীবাশ্মমুক্ত ভবিষ্যতের জন্য জনগণের সম্মেলন’ (People’s Summit for a Fossil-Free Future) এবং ‘জীবাশ্ম জ্বালানিমুক্ত ভূখণ্ডের সম্মেলন’ (Conference for Fossil-Fuel-Free Territories) সান্তা মার্তাকে শুধু একটি কূটনৈতিক আলোচনা প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ রাখেনি; জীবাশ্ম জ্বালানির বাইরে উত্তরণ বলতে আসলে কী বোঝায়, সেই প্রশ্নে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়ে এসেছে।

এই আলোচনাগুলির কেন্দ্রে ছিল মৌলিক একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন: এই উত্তরণ কি বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রকৃত রূপান্তরের পথ খুলে দেবে, নাকি কেবল ‘সবুজ’ আবরণের মধ্যে সম্পদ আহরণনির্ভর ব্যবস্থার (extractivism) পুনর্গঠন ঘটাবে? বহু নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং ভূখণ্ডভিত্তিক আন্দোলনের কাছে আশঙ্কার বিষয় ছিল, জ্বালানি উত্তরণকে যদি কেবল প্রযুক্তিগত প্রতিস্থাপনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে তেল, গ্যাস ও কয়লার জায়গা নেবে লিথিয়াম, কোবাল্ট, বিরল-মৃত্তিকা খনিজ, বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প এবং সবুজ বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে ওঠা নতুন সম্পদ-আহরণ ক্ষেত্র। এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাটি কেবল জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার গভীরে রয়েছে এমন এক বৃহত্তর সঞ্চয়ন-ব্যবস্থা, যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে উচ্ছেদ, বৈষম্যমূলক বিনিময় এবং প্রকৃতিকে পণ্যে পরিণত করার ওপর।

লাতিন আমেরিকা এবং ব্রাজিলের কয়েকটি সংগঠন এই অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তারা সতর্ক করে যে ‘উত্তরণ’ (transition) শেষ পর্যন্ত যেন কেবল নতুন ধরনের ‘লেনদেনে’ (transaction) পরিণত না হয়। এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে ক্রমবর্ধমান সেই উদ্বেগ, যেখানে কার্বনমুক্তকরণের ভাষাকে ব্যবহার করে সম্পদ আহরণের নতুন চক্র, পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং কর্পোরেট পুঁজি সঞ্চয়ের নতুন পর্বকে বৈধতা দেওয়া হতে পারে, অথচ পরিবেশ ধ্বংস ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী মৌলিক কাঠামোগুলি অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যে কোনো জীবাশ্ম-পরবর্তী ভবিষ্যৎ, যদি পরিবেশগত বলিদানক্ষেত্র (sacrifice zones), ভূখণ্ডচ্যুতি, উচ্ছেদ এবং বৈষম্যমূলক বাণিজ্য সম্পর্ককেই পুনরুৎপাদন করে, জ্বালানির উৎস বদলালেও সম্পদ-আহরণনির্ভর উন্নয়ন মডেলের যুক্তির মধ্যেই তা সীমিত থেকে যাবে।

ভূখণ্ড এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নও আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে আসে। আদিবাসী সংগঠন এবং একেবারে সামনের সারিতে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে জীবাশ্ম জ্বালানি

আহরণ, খননকার্য এবং নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্বাচিত বহু অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক সন্ত্রাস, উচ্ছেদ এবং পরিবেশ ধ্বংসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। ফলে জীবাশ্মমুক্ত উত্তরণের দাবি শুধুমাত্র পরিবেশগত দাবি নয়, ভূখণ্ডের ওপর স্বায়ত্তশাসন, সামুহিক অধিকার এবং ভূমি, জল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে সংশ্লিষ্ট একটি অভিমুখ।

সান্তা মার্তা প্রক্রিয়া থেকে রূপ পাওয়া উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ছিল ‘জীবাশ্ম জ্বালানিমুক্ত অঞ্চল’ (fossil-fuel-free zones) গঠনের ধারণা। এর লক্ষ্য এমন এক আঞ্চলিক কাঠামো নির্মাণ, যা সম্পদ আহরণমূলক কর্মকাণ্ডের আরও সম্প্রসারণকে সীমিত বা প্রতিরোধ করতে পারে। আদিবাসী আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির জোরালো সমর্থনপুষ্ট এই প্রস্তাব জলবায়ু নীতিকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডভিত্তিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে। এর মধ্যে ছিল নতুন অনুসন্ধান ও উত্তোলনের লাইসেন্স প্রদানে বিধিনিষেধ, বিদ্যমান খনি ও উত্তোলনক্ষেত্র ধাপে ধাপে বন্ধ করার পরিকল্পনা এবং পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো ব্যবস্থা। যদিও এই প্রস্তাবগুলি এখনও মূলত আকাঙ্ক্ষার স্তরেই রয়েছে, তবু এগুলি স্পষ্ট করে যে জলবায়ু রাজনীতিকে বিমূর্ত লক্ষ্য ও সংখ্যাগত অঙ্গীকারের ধোঁয়াটে গল্প পেরিয়ে ভূখণ্ডনির্ভর উত্তরণ পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

সম্মেলনের প্রস্তাবের সাথে গৃহীত জনগণের ঘোষণাপত্রেও (People’s Declaration) এই বিস্তৃত সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে। জলবায়ু উত্তরণকে সেখানে শুধু কার্বন নিঃসরণ হ্রাস বা জ্বালানি প্রযুক্তির প্রশ্ন হিসেবে দেখা হয়নি। পরিবর্তে কার্বনমুক্তকরণকে যুক্ত করা হয়েছে ক্ষতিপূরণভিত্তিক ন্যায়বিচার, ঋণ মকুব, জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকের অধিকার, আদিবাসী জনগণের সার্বভৌমত্ব, কৃষিবাস্তুশাস্ত্র (agroecology) এবং সামরিকবাদের (militarism) বিরোধিতার

মত মৌলিক দাবিগুলির সঙ্গে।

‘মিথ্যা-সমাধান’ প্রত্যাখ্যান

এই অবস্থান তথাকথিত ‘মিথ্যা সমাধান’ (false solutions)-এর গভীর সমালোচনা করে। প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণকারীরা বারবার সেই সব পদ্ধতির সমালোচনা করেন, যেগুলি একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন অব্যাহত রাখার সুযোগ দেয়, অন্যদিকে উত্তরণের অগ্রগতির দাবি করে। এর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন অফসেটের ওপর নির্ভরতা, কার্বন বাজারের সম্প্রসারণ এবং অনিশ্চিত প্রযুক্তিগত সমাধানের প্রতি আস্থা। সমালোচকদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ প্রকৃত জীবাশ্ম-পরবর্তী উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হওয়ার বদলে সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে চায় এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কাজ করে।

জনগণের ঘোষণাপত্রে তাই তথাকথিত একাধিক ‘মিথ্যা সমাধান’-কেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছ, যার মধ্যে রয়েছে কার্বন অফসেট, কল্পনা-নির্ভর ভূ-প্রকৌশল (geoengineering), বৃহৎ আকারের জৈবজ্বালানি প্রকল্প এবং কার্বন ধারণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। ঘোষণাপত্রের বক্তব্য ছিল, এই ধরনের পন্থা প্রায়শই জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতাকেই দীর্ঘস্থায়ী করে, অথচ তার পরিবেশগত ও সামাজিক খরচ চাপিয়ে দেয় সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা প্রান্তিকায়িত জনগোষ্ঠীর ওপর।

ঋণ, অর্থায়ন এবং সবুজ ঔপনিবেশিকতার আশঙ্কা

সান্তা মার্তার বহু আলোচনায় গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির সামনে থাকা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাগুলি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। ঋণগ্রস্ততা একটি বড় বাধা হিসেবে সামনে এসেছে। যেসব রাষ্ট্র তাদের রপ্তানি আয়ের বড় অংশের জন্য খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ওপর নির্ভরশীল, তাদের কাছে জীবাশ্ম

জ্বালানি থেকে সরে আসার প্রশ্নটি অবিলম্বে ঋণ, সরকারি আর্থিক স্থিতি, কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের অর্থায়নের মতো জটিল সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে। অংশগ্রহণকারীরা বারবার এমন এক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন, যাকে কেউ কেউ ‘ঋণ–জীবাশ্ম জ্বালানি ফাঁদ’ (debt-fossil fuel trap) বলে অভিহিত করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ঋণগ্রস্ত অর্থনীতিগুলি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধ এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কাঠামোগতভাবে আরও বেশি সম্পদ আহরণে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের আরও বেশি উত্তোলনকে উৎসাহিত করে। ফলে জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবি ক্রমশ ঋণ মকুব, অনুদানভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন, ভর্তুকি সংস্কার এবং উন্নয়ন অর্থায়নের পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের দাবির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

এই বিতর্কগুলি বৈশ্বিক জ্বালানি উত্তরণের অসম চরিত্রকেও সামনে নিয়ে আসে। শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলির হাতে যেখানে জ্বালানি ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য রয়েছে, সেখানে গ্লোবাল সাউথের বহু দেশকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে ঋণনির্ভরতা, বৈষম্যমূলক বাণিজ্য সম্পর্ক এবং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ অব্যাহত রাখার চাপের মধ্যে থেকে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া জলবায়ু রূপান্তরের আহ্বান রাজনৈতিকভাবে টেকসই হয়ে ওঠা কঠিন। আর এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলোচনায় ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে এক নতুন ‘সবুজ ঔপনিবেশিকতা’ (green colonialism)-র আশঙ্কা।

আইনি ও আর্থিক কাঠামো, কর্পোরেট ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ

সান্তা মার্তা সম্মেলন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য কাঠামোর ভূমিকাকেও নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে, বিশেষত সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে এই কাঠামোগুলি গণতান্ত্রিক উত্তরণের নীতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে

পারে।প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সান্তা মার্তা দেখিয়েছে যে আন্তর্জাতিক আইনি ও আর্থিক ব্যবস্থাগুলি এখনও কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বজায় রাখতে সহায়তা করছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল ইনভেস্টর-স্টেট ডিসপিউট সেটেলমেন্ট (ISDS) ব্যবস্থা। বিভিন্ন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এই আন্তর্জাতিক সালিশি কোম্পানিগুলিকে সেই সমস্ত সরকারি নীতির বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ দেয়, যা তাদের প্রত্যাশিত মুনাফাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। পরিবেশ সুরক্ষা বা জ্বালানি রূপান্তর-সংক্রান্ত নীতিও এর আওতায় পড়তে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানি সংস্থাগুলি বহুবার এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছে এইসব সরকারগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে
– যারা নিষ্কাশন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ, প্রকল্পগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা বা জ্বালানি ব্যবস্থার পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছে। আলোচনায় শেল ও এক্সনমোবিলের মতো সংস্থাকে ঘিরে আইনি বিরোধের উদাহরণও উঠে আসে, যা প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই জীবাশ্ম-পরবর্তী উত্তরণের পথে কাঠামোগত বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে উচ্চাভিলাষী রূপান্তর নীতি গ্রহণ করতে গেলে রাষ্ট্রগুলিকে শুধু অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চাপের মুখেই পড়তে হয় না; পাশাপাশি বহুজাতিক পুঁজির সমর্থনপুষ্ট ব্যয়বহুল আন্তর্জাতিক আইনি লড়াইয়েরও মোকাবিলা করতে হয়। অনেক অংশগ্রহণকারীর কাছে তাই আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে – সম্পদ আহরণনির্ভর পুঁজির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত বৈশ্বিক আইনি ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই কি রাষ্ট্রগুলি সত্যিকার অর্থে জলবায়ু উত্তরণের পথে এগোতে পারে?

সবুজ নিষ্কাশনবাদ ও বাস্তুতান্ত্রিক বিসর্জন

রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদকে ঘিরে বিতর্ক জীবাশ্ম-পরবর্তী কর্মসূচির আরেকটি বড় অন্তর্দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে আসে। সান্তা মার্তা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতার সমালোচনা করলেও, একই সঙ্গে এই আশঙ্কাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ডিকার্বনাইজেশন নতুন ধরনের নিষ্কাশনবাদকে উৎসাহিত করতে

পারে, যার ভিত্তি হবে রূপান্তর-প্রয়োজনীয় খনিজ এবং তথাকথিত সবুজ পরিকাঠামো। লিথিয়াম, কোবাল্ট, তামা, নিকেল এবং বিরল মৃত্তিকা খনিজের উত্তোলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা সামনে আসছে, তা এই আশঙ্কা তৈরি করেছে যে ‘সবুজ রূপান্তর’-এর পরিবেশগত মূল্য আবারও চাপিয়ে দেওয়া হবে প্রান্তিক অঞ্চল ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর ওপর। এমন পরিস্থিতিতে জীবাশ্ম পুঁজিবাদ বিলুপ্ত হবে না; বরং নতুন পণ্যশৃঙ্খল, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিজেকে পুনর্গঠিত করবে।

সান্তা মার্তা প্রক্রিয়ার ভেতরে ও বাইরে সক্রিয় আদিবাসী সংগঠন, ভূখণ্ডভিত্তিক আন্দোলন এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করা নেটওয়ার্কগুলি এই উদ্বেগকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। তাদের কাছে মূল প্রশ্ন কেবল জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প খুঁজে পাওয়া নয়; বরং এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কেমন সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা সতর্ক করেছেন যে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, কর্পোরেট বিনিয়োগ এবং তথাকথিত ‘গুরুত্বপূর্ণ খনিজ’-এর দ্রুত উত্তোলনের ওপর নির্ভরশীল ডিকার্বনাইজেশন পুরনো বঞ্চনা, পরিবেশ ধ্বংস, শ্রমশোষণ এবং অসম বিনিময়ের ধরণগুলিকেই নতুন রূপে পুনরুৎপাদন করতে পারে।

এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, বিপদটি হল রূপান্তর নিজেই নতুন পণ্যশৃঙ্খল, বিনিয়োগের নতুন সীমান্ত এবং পরিবেশগত বলিক্ষেত্র সৃষ্টি করে নিষ্কাশনভিত্তিক পুঁজিবাদকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে পারে। এর ফলে চাপ সরে যেতে পারে তেল ও কয়লাভিত্তিক অঞ্চল থেকে লিথিয়ামসমৃদ্ধ অববাহিকা, বিরল মৃত্তিকা খনিজের করিডর, বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প এবং গ্লোবাল সাউথ জুড়ে বিস্তৃত আদিবাসী ও গ্রামীণ ভূখণ্ডে। ‘সবুজ ঔপনিবেশিকতা’ (green colonialism) এবং ‘সবুজ নিষ্কাশনবাদ’(green extractivism) নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের উৎসও এখানেই। গ্লোবাল নর্থে ডিকার্বনাইজেশনের সাফল্য যদি অন্যত্র সম্পদ আহরণ ও ভূখণ্ডের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল হয় তবে সেই রূপান্তর কতটা ন্যায়সঙ্গত, সেই প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই উঠে আসে।

জীবাশ্ম নির্ভরতা ও অসম বিকাশ

প্রথম অন্তর্দ্বন্দ্বটি ছিল জোটটির গঠনগত চরিত্রেই। এই উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, অস্ট্রেলিয়া এবং নরওয়ের মতো রাষ্ট্র এখনও রপ্তানি আয়, রাজস্ব স্থিতি, কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য খননমূলক শিল্পের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। গ্লোবাল সাউথের বহু দেশের কাছে জীবাশ্ম জ্বালানি কেবল শক্তির উৎস নয়; তা এমন এক উন্নয়ন মডেলের ভিত্তি, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে জলবায়ু প্রতিশ্রুতি এবং উন্নয়নের তাগিদের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন তৈরি হয়। সরকারগুলি একদিকে রূপান্তরের ভাষ্য তুলে ধরতে পারে, অন্যদিকে ঋণের বোঝা, রাজস্ব সংকট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার চাপে নিষ্কাশনমূলক কর্মকাণ্ড আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী এবং প্রভাবশালী ভূরাজনৈতিক শক্তিগুলির অনুপস্থিতি সান্তা মার্তা জোটের সীমাবদ্ধতাগুলিকেও স্পষ্ট করে তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, রাশিয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান তেল-উৎপাদক রাষ্ট্রগুলি এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়নি। তাদের অনুপস্থিতি জাতিসংঘ কাঠামোর বাইরে গড়ে ওঠা বাস্তবায়নমুখী জোটগুলির সম্ভাবনা যেমন দেখিয়েছে, তেমনি তাদের সীমাও তুলে ধরেছে। একদিকে ঐকমত্যভিত্তিক অচলাবস্থা থেকে মুক্ত ছোট জোটগুলি তুলনামূলকভাবে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে প্রধান শক্তিগুলির অনুপস্থিতি এই উদ্যোগগুলির পরিসর, কার্যকারিতা এবং ভূরাজনৈতিক প্রভাবক্ষমতা নিয়ে কঠিন প্রশ্নও উত্থাপন করে। বৈশ্বিক জীবাশ্ম অর্থনীতির কেন্দ্রীয় শক্তিগুলিকে বাইরে রেখে গড়ে ওঠা যে কোনও রূপান্তর প্রক্রিয়ার পক্ষেই বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ব্যবস্থাকে আমূল পুনর্গঠন করা স্বভাবতই কঠিন।

সম্মেলনটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান খণ্ডিত চরিত্রকেও সামনে

এনেছে। জলবায়ু রাজনীতি ক্রমশ বাণিজ্যযুদ্ধ, সামরিক সংঘাত, জ্বালানি নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা এবং কৌশলগত সম্পদকে ঘিরে ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট জ্বালানি-ধাক্কা আবারও দেখিয়ে দিয়েছে যে জীবাশ্ম জ্বালানি এখনও বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোর গভীরে প্রোথিত। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলি একদিকে মুখে ডিকার্বনাইজেশনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তা, শিল্প প্রতিযোগিতা এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের স্বার্থে নিষ্কাশন ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে পারে।

বিশ্ব পুঁজিবাদের অসম বিকাশের প্রেক্ষাপটে এই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কার্বন-নির্ভর প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে নিজেদের সমৃদ্ধি গড়ে তুলেছে অথচ যেসব দেশকে এখন দ্রুত রূপান্তরের পথে হাঁটার কথা বলা হচ্ছে, তাদের অনেকেই এখনও বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কাঠামোগতভাবে অধস্তন অবস্থানে রয়েছে। ফলে দ্রুত ডিকার্বনাইজেশনের দাবি প্রায়শই এসে ঠেকে ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা, জলবায়ু ঋণ, প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার এবং বৈশ্বিক আর্থিক ক্ষমতার বৈষম্যের প্রশ্নে। বৃহৎ পরিসরে সরকারি অর্থায়ন, ঋণমুক্তি এবং সম্পদের পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা না থাকলে, এই রূপান্তর বিদ্যমান বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করার বদলে সেগুলিকেই আরও দৃঢ় করে তুলতে পারে।

রাষ্ট্র, সামাজিক আন্দোলন এবং রূপান্তরের বিরুদ্ধ কল্পনা

সান্তা মার্তার বিতর্কগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে জীবাশ্ম জ্বালানির বাইরে উত্তরণের প্রশ্নটি কেবল প্রযুক্তিগত বা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ নয়। এটি একই সঙ্গে উন্নয়নের মডেল, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত অধিকার, আর্থিক ক্ষমতার বিন্যাস এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির অসম সংগঠনকে ঘিরে এক রাজনৈতিক সংগ্রাম। সেই কারণেই সম্মেলনটি এমন দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে

ক্রমবর্ধমান বিভাজনকে সামনে নিয়ে এসেছে যার একদিকে রয়েছে সবুজ প্রবৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত অভিযোজনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উত্তরণের ধারণা; অন্যদিকে রয়েছে উৎপাদন, ভোগ, মালিকানা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় আরও গভীর ও মৌলিক পরিবর্তনের দাবি।

সম্মেলনটি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে ঘিরে থাকা অমীমাংসিত টানাপোড়েনগুলিকেও সামনে এনেছে। সান্তা মার্তা যেখানে কপ কাঠামোর বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রূপান্তর-সংক্রান্ত নীতির সমন্বয় সাধনের একটি প্রচেষ্টা ছিল, সেখানে বহু কর্মী, সামাজিক আন্দোলন এবং নাগরিক সংগঠন রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন সেই সব রূপান্তর কৌশল সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছে, যা এখনও প্রবৃদ্ধিনির্ভর উন্নয়ন মডেল এবং বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সান্তা মার্তাকে তাই কোনও সুসংহত বিকল্প মডেল হিসেবে দেখা সঙ্গত হবে না; একে বলা যায়, জীবাশ্ম-পরবর্তী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, নানাবিধ এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি সাময়িকভাবে একত্রিত ও মুখোমুখি হবার। যেখানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ রূপান্তরকে মূলত সবুজ শিল্পনীতি, বিনিয়োগের সমন্বয় এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। অন্যদিকে, অনেকের কাছে এই রূপান্তর ছিল নিষ্কাশনবাদবিরোধী রাজনীতি, ঐতিহাসিক ক্ষতিপূরণমূলক ন্যায়বিচার, আদিবাসী সার্বভৌমত্ব এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ফলে সম্মেলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্ভবত এই মতভেদগুলির সমাধান করার মধ্যে নয়; বরং জ্বালানি ও উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক আলোচনার পরিসরে সেগুলিকে দৃশ্যমান করে তোলার মধ্যেই নিহিত।

এই কারণেই সান্তা মার্তা জোটের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ কেবল নীতির বাস্তবায়ন নয়, রাজনৈতিক সামঞ্জস্যও। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী ও রূপান্তরমুখী শক্তিতে পরিণত হবে কি না, তা নির্ভর করবে জীবাশ্ম নির্ভরতাকে

পুনরুৎপাদন করে চলা কাঠামোগত কারণগুলির মোকাবিলা করার সক্ষমতার ওপর—যেমন অসম বিকাশ, কর্পোরেট ক্ষমতা, ঋণনির্ভর আর্থিক ব্যবস্থা, ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং নিষ্কাশনভিত্তিক সঞ্চয়ের মডেল। এই গভীরতর অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিকে স্পর্শ না করতে পারলে জীবাশ্ম জ্বালানি-পরবর্তী রূপান্তর শেষ পর্যন্ত সেই একই আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যেতে পারে, যে ব্যবস্থা জলবায়ু সংকটের জন্ম দিয়েছে।

উপসংহার

একথা ঠিক যে সান্তা মার্তা সম্মেলনে কোনও বাধ্যতামূলক জীবাশ্ম জ্বালানি-বিরোধী চুক্তি গড়ে ওঠেনি কিংবা বৈশ্বিক জ্বালানি রূপান্তরকে ঘিরে থাকা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিরও সমাধান হয়নি। কলম্বিয়ায় যে জোটের উদ্ভব হয়েছে, তা এখনও রাজনৈতিকভাবে অসম, অর্থনৈতিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং ভূরাজনৈতিকভাবে অসম্পূর্ণ। অংশগ্রহণকারী বহু রাষ্ট্র এখনও নিষ্কাশনভিত্তিক অর্থনীতির আয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলি এবং জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদক শক্তিগুলির কয়েকটি এই প্রক্রিয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। জীবাশ্ম-পরবর্তী যে কোনও রূপান্তরের সামনে থাকা কাঠামোগত বাধাগুলি, যেমন – ঋণনির্ভরতা, অসম বিকাশ, কর্পোরেট ক্ষমতা, ভূরাজনৈতিক খণ্ডীকরণ এবং নিষ্কাশনভিত্তিক পুঁজিকে সুরক্ষা প্রদানকারী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো – এখনও অটুট।

তবু সান্তা মার্তার গুরুত্ব এখানেই যে, এই সম্মেলন বহুপাক্ষিক কূটনীতির আনুষ্ঠানিক ভাষার আড়ালে উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলিকে আড়াল না করে বরং আরও স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। জীবাশ্ম-পরবর্তী ভবিষ্যতের কোনও চূড়ান্ত রূপরেখা দেওয়ার পরিবর্তে, এই সম্মেলন এমন এক রাজনৈতিক পরিসরে পরিণত হয়েছে যেখানে সরকার, বিজ্ঞানী, সামাজিক আন্দোলন, আদিবাসী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলি এমন কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, যেগুলিকে বিদ্যমান জলবায়ু ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত এড়িয়ে

এসেছে। যেমন – কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর নিষ্কাশনের ওপর নির্ভরতা কমানো যায়? কীভাবে ঋণ ও বৈষম্যকে পুনরুৎপাদন না করে রূপান্তরের অর্থায়ন করা সম্ভব? কীভাবে জ্বালানি রূপান্তরকে ভূখণ্ডগত ন্যায়বিচারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়? এবং কীভাবে এমন ‘সবুজ রূপান্তর’- যা নতুন প্রযুক্তি, খনিজ সম্পদ এবং আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশনবাদকে কেবল নতুন রূপে পুনর্গঠিত করে,তার বাইরে যাওয়া যায়?

এই অর্থে সান্তা মার্তা জলবায়ু রাজনীতির বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক জলবায়ু কূটনীতি মূলত নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্য, প্রশমন প্রতিশ্রুতি, বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা এবং ক্রমশ অচল হয়ে পড়া প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সান্তা মার্তা প্রক্রিয়া দেখিয়েছে যে জলবায়ু সংকটের মোকাবিলা করতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানির রাজনৈতিক অর্থনীতির মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য – অর্থাৎ সেই বাণিজ্য, অর্থায়ন, বিনিয়োগ এবং ভূরাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোগুলির, যেগুলির মাধ্যমে জীবাশ্ম নির্ভরতা ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয়।

সম্মেলনটি আরও ইঙ্গিত করেছে যে ‘জ্বালানি রূপান্তর’-এর অর্থও এখন বদলে যাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার প্রশ্ন আর কেবল পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তা ক্রমশ সার্বভৌমত্ব, ঋণ, শিল্প কাঠামোর পুনর্গঠন এবং ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠছে। যুদ্ধ, জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু রাজনীতি আজ আরও প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নের মডেল, কৌশলগত সম্পদ এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

সান্তা মার্তা জোট দীর্ঘস্থায়ী এবং রূপান্তরমুখী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। এর অনেকটাই নির্ভর করবে অংশগ্রহণকারী

দেশগুলি ঘোষণার স্তর অতিক্রম করে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে কি না তার ওপর
– বিশ্বাসযোগ্য রূপান্তর রূপরেখা তৈরি, আর্থিক অগ্রাধিকারের পুনর্বিন্যাস, নতুন জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পের সম্প্রসারণ সীমিত করা এবং গ্লোবাল সাউথে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরকে সমর্থন করতে সক্ষম কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা কূটনৈতিক প্রতীকী সাফল্যে নয়, বরং বাস্তবে কতটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তার ভিত্তিতেই বিচার করা হবে।

দীর্ঘস্হায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে এক অবিচল প্রতিশ্রুতি হিসেবে সান্তা মার্তা সম্মেলনের পক্ষে ইতিমধ্যেই ‘জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার জন্য’ দ্বিতীয় সম্মেলনের ঘোষণা করা হয়েছে, যা ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হবে। যৌথ আয়োজক টুভালু এবং আয়ারল্যান্ড। মূল সম্মেলন হবে টুভালুতে আর একটি প্রাক-সম্মেলন বৈঠক হবে আয়ারল্যান্ডে। এখন এটাই দেখার যে সান্তা মার্তার ‘ইচ্ছুকদের জোট'( coalition of the willing) টুভালুতে গিয়ে ‘কর্মতৎপরদের জোট’ (coalition of the doers) হয়ে উঠতে পারে কি না এবং আসন্ন কপ(COP) প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে কি না।

তবে সান্তা মার্তা একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে—বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামোর সন্ধান শুরু হয়েছে, যা প্রচলিত জলবায়ু কূটনীতির ক্লান্ত ও অকার্যকর স্থাপত্যের বাইরে নতুন পথ খুঁজতে চায়। এই সম্মেলন কোনও জীবাশ্ম-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি ঠিকই। কিন্তু এই রূপান্তর কীভাবে ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত কার স্বার্থে পরিচালিত হবে—তা নিয়ে সংগ্রাম যে এখন এক নতুন এবং আরও প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, সান্তা মার্তা নি:সন্দেহে তারই এক স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী সূচনাবিন্দু।

রচনাটি অনীক পত্রিকার আগস্ট ২০২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত

About the Author



Debajit Chanda

Administrator

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint.

View All Posts



Debajit Chanda

+ posts

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint.